ISSN 2227-1635
বাঙলা সাহিত্যিকী ৬ষ্ঠ সংখ্যা, পৌষ ১৪২৬

পতিসরে রবীন্দ্রনাথ: সৃষ্টি ও কর্ম

*ড. মোহাম্মদ শামসুল আলম

Abstract: Rabindrawnath was a great litreary stalwart in the field of bangla language and literature. He is recognized as a mighty poet and writer all over the world and for this reason he received Nobel Prize. Inspite of this, he was also a society-conscious and humanitarian writer the signs of which we get from Patisar of Naogaon. He came to Patisar to perform Zamindary duties and mixed with people from close quarters and gathered much experience. He presented these experiences in his poems, poetry and writings. Today's Patisar and Rabindrawnath' is the main subject of discunion.

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১-১৯৪১) মূলত বিশ্বকবি হিসেবে সারাবিশ্বে পরিচিত। বিশ্বকবিকে যখন পতিসরের জমিদার বাবু হিসেবে পাওয়া যায়, তখন সহসায় একটি প্রতীতিজাত ভাবনার উদ্রেক জাগ্রত করে। কলকাতার জোড়াসাঁকো ঠাকুর পরিবারের জমিদারি ছিল বাংলাদেশের শিলাইদহ, শাহজাদপুর ও পতিসরে। পতিসরের জমিদারিটি ছিল বেশ বড়। ১৮৯৪ খ্রিস্টাব্দে বার্ষিক খাজনা আদায়ের পরিমাণ ছিল ৫০৪২০/- (পঞ্চাশ হাজার চারশত কুড়ি) টাকা।[১] দ্বারকানাথ ঠাকুর কালিগ্রাম পরগনার জমিদারিটি পত্তন করেন। পরবর্তীতে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর পতিসরে কাচারিবাড়ি স্থাপন করেন। এই কাচারি বাড়ি থেকেই কালিগ্রাম পরগনার কাজ-কর্ম পরিচালনা করা হতো। ১৯২০ খ্রিস্টাব্দে ঠাকুর পরিবারে জামদারি ভাগাভাগি হয়। বণ্টনের সূত্রে কবির ভাগে পড়ে কালিগ্রাম পরগনার জমিদারি। আত্রাই, রাণীনগর, সাহাগোলা, রঘুনাথপুর, সান্তাহার, তালোড়া, তিলকপুর, আদমদিঘি ও নশরতপুর অঞ্চল ছিল কালিগ্রাম পরগনার অন্তর্ভুক্ত। আর কালিগ্রাম পরগনার সদরদপ্তর ছিল পতিসরে। এই পতিসরে ছিল রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরেরই কাচারি বাড়ি। আজো এই কাচারি বাড়িটি কালের স্মারকচিহ্ন হিসেবে স্মৃতিকে ধারণ করে আছে। এখানে আজ কবি নেই, কিন্তু তাঁর কাচারি বাড়িটি জানান দিচ্ছে কবির উপস্থিতিকে। কবি যখন এখানে আসেন তখন এটি ছিল নিতান্তই একটি অজপাড়া গাঁ। তবে আজ যে কথাই বলবার চেষ্টা করি না কেন, কবি এখানে এসেছিলেন এবং বাস করেছেন সেটিই মুখ্য বিষয়। বিশেষত জমিদারি তদারকির অংশ হিসেবে তাঁর অবস্থানকালে যে সব স্মৃতি ও কৃতকর্মের পরিচয় আমরা পতিসরে পেয়ে থাকি তারই উপস্থাপনা নিবন্ধের মূল প্রতিপাদ্য বিষয়।

পতিসরে অবস্থান করার পর এখানকার পরিস্থিতি ও পরিবেশ সম্পর্কে কবির যে প্রথম অভিজ্ঞতা সে বিষয়ে কবি নিজেই বলেছেন—

> বেশ কুঁড়েমি করবার মত বেলাটা। কেউ তাড়া দেবার লোক নেই। তাছাড়া প্রজা এবং কাজের ভিড়ে এখনো চতুর্দিকে ছেঁকে ধরে নি। সবসুদ্ধ খুব ঢিলে ঢিলে একলা একলা কী এক রকম মনে হচ্ছে। যেন পৃথিবীতে অত্যাবশ্যক কাজ বলে একটা কিছুই নেই। এমন কি, নাইলেও চলে না-নাইলেও চলে এবং ঠিক সময় মত খাওয়াটা কলকাতার লোকের

* সহযোগী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, নওগাঁ সরকারি কলেজ, নওগাঁ

> মধ্যে প্রচলিত একটা বহুদিনের কুসংস্কার বলে মনে হয়। এখানকার চতুর্দিকের ভাবগতিকও সেই রকম।[২]

কবির পতিসরে প্রথম আগমনকালের অভিজ্ঞতার কথা জানা যায় তাঁর *ছিন্ন পত্রাবলী* গ্রন্থে। প্রত্যক্ষভাবে পতিসরে এসে যা দেখেছিলেন তার কোনো রকম রাগ-ঢাক ছাড়াই তিনি তা অকপটে বর্ণনা করেছেন। কল্পনা বিলাস বা লীলা বিলাসের কথা কবি এখানে এসে একেবারেই ভুলে গিয়েছিলেন। কলকাতার জীবন ও পরিবেশের তুলনায় বাংলাদেশ যে কবিকে খুব ভালো লেগেছিল তার বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে কবির নিজের ভাষায়—

> ঠিক মনে হচ্ছে যেন তারা জলের নিচেকার নিগূঢ় রহস্য আবিষ্কার করার জন্যে প্রতিক্ষণেই গলা বাড়িয়ে দিচ্ছে এবং তারপরে সবেগে মাথা নেড়ে বলছে, 'কিছুই না কিছুই না'। এখানকার দিনগুলো এই রকম বারো ঘণ্টা পড়ে কেবল রোদ পোহায় এবং অবশিষ্ট বারো ঘণ্টা খুব গভীর অন্ধকার মুড়ি দিয়ে নিঃশব্দে নিদ্রা দেয়। এখানে সমস্তক্ষণ বাইরের দিকে চেয়ে চেয়ে কেবল নিজের মনের ভাবগুলোকে বসে বসে দোলা দিতে ইচ্ছে করে। তার সঙ্গে একটু একটু গুন্ গুন্ করে গান গাওয়া যায়। মাঝে মাঝে বা ঘুমে চোখ একটু অলস হয়ে আসে। মা যেমন করে শীতকালের সারা বেলা রোদদুরে পিঠ দিয়ে ছেলে কোলে করে গুন্ গুন্ স্বরে দোলা দেয়, সেই রকম।[৩]

পতিসরের নিরিবিলি জীবন-যাপন ও অনুভূতির কথা কবি এভাবে মিষ্টি ভাষায় প্রকাশ করেছেন। নদীপথে বোটে ঘুরে ঘুরে কিংবা জমিদারি পরিচালনাকালে কাচারিতে বসে সুখী-দুঃখী নানা ধরনের মানুষের সাথে সাক্ষাৎ লাভ করেছেন। ফলে কবির হৃদয়ে এক ধরনের আলোড়নের সৃষ্টি হয়েছে। ফলশ্রুতিতে সৃষ্টি হয়েছে অসাধারণ সাহিত্যকর্ম। কবির দৃষ্টিতে তখন ধরা পড়েছে কুলগাছ, আমগাছ, বটগাছ, বাঁশঝাড়, উলঙ্গশিশু, লজ্জাশীলা বধূ ইত্যাদি। যার মধ্যে কেবল চরম বাস্তবতা ও সত্য ছাড়া আর কিছুই নেই।

নওগাঁ জেলা সদর থেকে প্রায় ৪০ কি.মি. দক্ষিণে থানা সদর *আত্রাই* উপজেলার অধীন *মনিয়ারী* ইউনিয়নে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাচারি বাড়িটি অবস্থিত। এই উপজেলার অধীন একটি মফস্বল পাড়াগ্রাম পতিসর। নওগাঁ জেলার পতিসরে কালিগ্রাম পরগনা নিয়ে কলকাতা জোড়াসাঁকো ঠাকুর পরিবারের ছিল বিশাল জমিদারি। জমিদারি দেখাশোনার জন্য বাবার নির্দেশে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর পতিসরে প্রথম আসেন ১৮৯১ খ্রিস্টাব্দের ১৫ জানুয়ারি (১২৯৭ বঙ্গাব্দ)।[৪] দ্বিতীয়বার পতিসরে আসেন ১৩০০ বঙ্গাব্দের (১৮৯৩ খ্রি.) শ্রাবণ মাসে। ২৭ শ্রাবণ তিনি পতিসরে বসে চিঠি লিখেছেন। সেই চিঠিতে লোকসাহিত্যের প্রতি রবীন্দ্রনাথের আগ্রহ প্রকাশ পায়। এ সময় কবি তাঁর 'বিদায়-অভিশাপ' নামক কাব্য নাটকটির রচনা সমাপ্ত করেন। ১৩০০ বঙ্গাব্দের ৮ ফাল্গুন কবি ইন্দিরা দেবীকে একটি চিঠি লিখেছিলেন। বঙ্গাব্দের এই ফাল্গুন মাসে কবির অবস্থান যে পতিসরে ছিল সে বিষয় সম্পর্কেও অবগত হওয়া যায়। এ সময় কবির বাল্যবন্ধু ও তৎকালীন রাজশাহীর জেলা জজ লোকেন্দ্রনাথ পালিতের আমন্ত্রণে রবীন্দ্রনাথ প্রথম রাজশাহী সফরে আসেন। ১৮৯২ খ্রিস্টাব্দের ১৩ নভেম্বর থেকে ৩০ নভেম্বর পর্যন্ত ১৮ দিন রাজশাহীতে অবস্থান করেন। এখানে অবস্থানকালীন রাজশাহী এসোসিয়েশন ২৬ নভেম্বর শনিবার এক সাহিত্যসভার

আয়োজন করে। ভেনু হিসেবে স্থান ছিল রাজশাহী কলেজ। এ সভায় কবি তাঁর শিক্ষা বিষয়ক প্রবন্ধ 'শিক্ষার হেরফের' পাঠ করেন।

১৩০১ বঙ্গাব্দের ২৬ ভাদ্র কবি শাহজাদপুর থেকে পতিসরে আসেন। পতিসরে পৌঁছেই যাত্রাপথের বিবরণ দিয়ে ইন্দিরা দেবীকে পত্র লেখেন। এখানে কয়েক দিন থাকার পর ৫ আশ্বিন (২০ সেপ্টেম্বর) কবি তাঁর বাল্যবন্ধু লোকেন্দ্রনাথ পালিতের সাথে দেখা করার জন্য রাজশাহীতে নদী পথে যাত্রা করেন। ৭ আশ্বিন রাজশাহীতে পৌঁছেন এবং রাজশাহী থেকে ২৯ সেপ্টেম্বর কলকাতয় ফিরে যান। পরের বছর ১৩০২ বঙ্গাব্দে ১৮ জ্যৈষ্ঠ নদীপথে যাত্রা করে ১৯ জ্যৈষ্ঠ পতিসরে আসেন। এরপর সেখানে বসেই কবি ৩১ জ্যৈষ্ঠ (১৩ জুন) তারিখে 'দুই বিঘা জমি' কবিতাটি রচনা করেন।[৫] কবিতাটির মধ্য দিয়ে উপেন নামের একজন অত্যাচারিত প্রজার বিলাপ ও আকুতি বেদনাময় ভাষায় চিত্রকল্প হিসেবে ফুটে উঠেছে। ২১ জ্যৈষ্ঠ তারিখে ইন্দিরা দেবীকে যে পত্রটি দিয়েছিলেন সেখানে বর্ষা প্রকৃতির বর্ণনা উপস্থাপিত হয়েছিল। কবির ভাষায়—

> 'অনেকগুলো বড়ো বড়ো বিলের মধ্য দিয়ে আসতে হয়েছে। এই বিলগুলো ভারী অদ্ভুত—কোনো আকার আয়তন নেই, জলে স্থলে একাকার—পৃথিবী সমুদ্রগর্ভ থেকে নতুন জেগে উঠবার সময় যেমন ছিল। কোথাও কিছু কিনারা নেই— খানিকটা জল, খানিকটা মগ্নপ্রায় ধান ক্ষেতের মাথা, খানিকটা শেওলা এবং জলজ উদ্ভিদ ভাসছে—পানকৌড়ি সাঁতার দিচ্ছে, জাল ফেলবার জন্যে বড়ো বড়ো বাঁশ পোঁতা, তারই উপর কটা রঙের বড়ো চিল বসে আছে—ভারী একাকার একঘেয়ে রকমের দৃশ্য। দ্বীপের মতো অতি দূরে গ্রামের রেখা দেখা যাচ্ছে—যেতে যেতে হঠাৎ আবার খানিকটা নদী, দুধারে গ্রাম, পাটের ক্ষেত এবং বাঁশের ঝাড়, আবার কখন যে সেটা বিস্তৃত বিলের মধ্যে মিলিয়ে যাচ্ছে বোঝবার যো নেই। ঠিক সূর্যাস্তের কাছাকাছি সময় যখন একটি গ্রাম পেরিয়ে আসছিলুম, একটা লম্বা নৌকোয় অনেকগুলো ছোকরা ঝপ্ ঝপ্ করে দাঁড় ফেলছিল এবং সেই তালে গান গাচ্ছিল—
>
> যোতী ক্যান বা কর মন ভারী?
> পাবনা থাক্যে আন্যে দেব
> ট্যাকা দামের মোটরি।'[৬]

কলকাতার মানুষ যুবতীর মন ভারি দেখলেই সাথে সাথে জীবন দিতে বা নন্দনকানন থেকে পারিজাত এনে দেবার জন্য প্রস্তুত হয়। অথচ এখানে দেখা যায় মানুষ খুব সুখে আছে। কারণ অল্প ত্যাগ স্বীকারেই যুবতীর মন পাওয়া যায়। কবির সহজ-সরল কথার মধ্য দিয়ে বিলের প্রান্তে বসে যুবতীর মন ভারী হবার আবেদনটি একটি চিত্র হিসেবে উপস্থাপিত হয়েছে। এরপর কবি পতিসর আসেন ১৩০২ বঙ্গাব্দে পদ্মাবোটে। এর দুদিন পর কবি ইন্দিরা দেবীকে পত্র লেখেন। সে বছর রবীন্দ্রনাথ ৫০টির মতো কবিতা লিখেছিলেন। তার মধ্যে প্রথম ভাগের কবিতাগুলো শিলাইদহে, মাঝেরগুলো পতিসরে এবং শেষেরগুলো শাহজাদপুরে। এরপর ১৩০৪ বঙ্গাব্দের ৯ আশ্বিন মাসে শাহজাদপুর থেকে কবি নদীপথে রওনা দিয়ে আশ্বিন মাসের ১০ তারিখে পতিসরে পৌঁছেন। যাত্রাপথে তিনি চলন বিলের মধ্যদিয়ে নাগর নদ পাড়ি দিয়ে পতিসরে আসেন। এই যাত্রাপথেই তিনি কয়েকটি গান রচনা করেন। গানগুলো হলো-

- যদি বারণ কর, তব গাহিব না' (০৯ আশ্বিন, চলনবিল)। [দ্রষ্টব্য: সেদিন যাত্রা পথে কয়েকবার ঝড় হয়েছিল।]
- আমি চাহিতে এসেছি শুধু একখানি মালা (১০ আশ্বিন, নাগরনদ)।
- সখি প্রতিদিন হায় এসে ফিরে যায় কে (১০ আশ্বিন, নাগরনদ)।
- বিধি ডাগর আঁখি যদি দিয়েছিলে (১০ আশ্বিন, নাগরনদ-ধানক্ষেতের ভিতর)।
- বধূ মিছে রাগ কোরো না (১০ আশ্বিন, পতিসর পৌঁছে)।
- ওগো কাঙাল, আমারে কাঙাল করেছ (১২ আশ্বিন, পতিসর)।
- এ কি সত্য সকলি সত্য (১৩ আশ্বিন, কলকাতার রেল পথ)।[৭]

যাত্রাপথেই গানগুলো রচনা করেন এবং কবি কয়েকদিন সেখানে থাকার পর ১৩ আশ্বিন কলকাতায় ফিরে যান।

এরপর ১৩০৫ বঙ্গাব্দের আষাঢ় মাসের প্রথম সপ্তাহে নদীপথে আত্রাই আসেন। পতিসর থেকে আত্রাই যাবার পথে তিনি 'কল্পনা' কাব্যের 'হতভাগ্যের গান' কবিতাটি লেখেন। একই দিনে তিনি স্বাদেশিক মানসিকতায় নিবেদিত হয়ে রচনা করেন 'মাতার আহবান' নামক কবিতাটি। বলেন্দ্রনাথকে সাথে নিয়ে পুণ্যাহ অনুষ্ঠানে যোগদানের জন্য কবি পতিসরে আবার আসেন ২২ আষাঢ়। পরের বছর ১৩০৬ বঙ্গাব্দে কবি রবীন্দ্রনাথ কালিগ্রাম পরগনার পুণ্যাহ অনুষ্ঠানে যোগ দেয়ার জন্য ২৩ আষাঢ় শনিবার পতিসরে আসেন। এ যাত্রায় কবি কলকাতয় ফিরে যান ২৮ আষাঢ়। এ সময়ে কলকাতায় *ক্ষণিকা* কাব্যের মুদ্রণ কাজ চলছিল; বিধায় কবি খুব তড়িঘড়ি করে কলকাতায় চলে যান। এই একই বর্ষের চৈত্রমাসে কালিগ্রাম পরগনায় দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। ফলে জমিদারির আয় কমে যায়।[৮] ১৩০৭ বঙ্গাব্দের আষাঢ় মাসে পুনরায় কবি পুণ্যাহ অনুষ্ঠানে যোগ দেয়ার জন্য পতিসরে আসেন। ২৩ আষাঢ় অনুষ্ঠান শেষে কলকাতায় ফিরে যান। আবার একই বছরের শ্রাবণ মাসে পতিসরে আসেন। এখানেই তিনি তাঁর বিখ্যাত গান—'যাবই আমি যাবই ওগো, বাণিজ্যেতে যাবই'; গানটি রচনা করেন। এরপর কবি অনেক দিন পতিসরে আসেন নি।

রবীন্দ্রনাথের আবার পতিসরে আসেন ১৩০৯ বঙ্গাব্দের আষাঢ় মাসে। এ সময় পতিসর কাচারি বাড়িতে কর্মরত সংস্কৃত শাস্ত্রের পণ্ডিত হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মাধ্যমে আগমনের খবরটি সম্পর্কে জানা যায়। সেই সাথে কবি পত্নী মৃণালিনী দেবীকে লেখা একটি পত্রের মাধ্যমেও পতিসরে আগমনের বিষয়টি সম্পর্কে অবগত হওয়া যায়। কবির ভাষায়—

> 'দ্বীপের মতো এক-এক খণ্ড উচ্চভূমির উপর গুটিকতক কলাগাছ এবং কুলগাছের মধ্যে কুষ্মাণ্ডলতায় সমাকীর্ণ গুটি দুই-তিন খোড়ে ঘর, তারই অঙ্গনে দাঁড়িয়ে উলঙ্গ শিশু এবং কৌতূহলী বধূগণ বিস্মিত দৃষ্টিতে আমার বোট নিরীক্ষণ করছে—সাদা কালো রঙের পাতিহাঁস জলের ধারে দল বেঁধে ঠোঁটের খোঁচা দিয়ে শশব্যস্তে পিঠের পালকগুলি পরিষ্কার করছে—দূরে বাঁশঝাড় এবং ঘন তরুশ্রেণি দিগন্ত অবরোধ করে দাঁড়িয়ে আছে—খানিকটা দূর দুই ধারে শূন্য মাঠ—আবার হঠাৎ এক জায়গায় ছেলেদের চেঁচামেচি, স্নানার্থিনী মেয়েদের কলহাস্যালাপ, শোকাতুরা প্রৌঢ়ার বিলাপ ধ্বনি, কাপড় কাচার ছপ্‌ছপ— স্নানাভিহত জলের ছল্‌ছল্ শব্দ শুনে মুখ তুলে দেখি ঘনছায়া গ্রামের

> ধারে একটি ঘাট এসেছে, গোটা দুয়েক নৌকো বাঁধা আছে এবং অনিচ্ছুক রোরুদ্যমান ছেলের নড়া ধরে তার মা জোর করে স্নান করাচ্ছে।'[৯]

১৩০৯ বঙ্গাব্দে পতিসরে এসে কবির মনে নদীতীরের উজ্জ্বল জগতটি ধরা পড়েছে। পতিসরে এসে তিনি এবার জমিদারির তদারকির পরিবর্তে স্বাস্থ্য সম্পর্কিত বিষয়ে স্ত্রীর কাছে পত্র লিখে জানিয়েছেন—'একদিন জলের মধ্যে পরিপূর্ণ নির্জনতার মধ্যে নিঃশব্দে বাস করে আমার শরীরের অনেক উপকার হয়েছে। আমি বুঝেছি আমার হতভাগা ভাঙ্গা শরীরটা শোধরাতে গেলে একলা জলের উপর আত্মসমর্পণ করা ছাড়া আমার কোনো উপায় নেই।'[১০] এ যাত্রায় হাইকোর্টের মামলার কারণে ১ ভাদ্র (২২ আগস্ট) তারিখে কলকাতায় ফিরে যান। এরপর প্রায় ৩ বছর আর কবি পতিসরে আসেন নি। প্রায় ৩ বছর পর কবিকে পতিসরে দেখা যায় ১৩১২ বঙ্গাব্দের ২৮ আষাঢ়। ৩১ আষাঢ় কবি কলকাতায় ফিরে যান। এ সময় বৈষয়িক কিছু ঝামেলা নিয়ে কবি উদ্বিগ্ন ছিলেন মর্মে অবগত হওয়া যায়।

জানকীনাথ রায়ের মাধ্যমে অবগত হওয়া যায় যে, কবি পুনরায় পতিসরে আসেন ১৩১৫ বঙ্গাব্দের বৈশাখ মাসে পুণ্যাহ অনুষ্ঠানে যোগ দেয়ার জন্য। ২১ বৈশাখ (৪ মে ১৯০৮) কবি জানকীনাথ রায়কে লিখেছেন—

> 'কালিগ্রাম পরগনাকেও আমি মহলে মহলে বিভক্ত করিয়া কার্যের ব্যবস্থা করিব। কিরূপ ভাগ করা যাইতে পারে এবং সেরেস্তার বর্তমান কোন্ কোন্ কর্ম্মচারী দ্বারা তাহার কাজ কিরূপ চালানো যাইবে তাহাও চিন্তা করিয়া দেখিবে। যদি কালিগ্রামে ইতিমধ্যে সুবৃষ্টি হয় তবে পুণ্যাহের সময় আমি স্বয়ং সেখানে গিয়া নূতন ব্যবস্থার প্রবর্ত্তন করিব।'[১১]

এরপর পতিসর থেকে ফিরে যান শিলাইদহে। সেখান থেকে কলকাতায় চলে যান। পরের বছর ১৩১৬ বঙ্গাব্দের ৫ই অগ্রহায়ণ মাসে কবি পুত্র রথীন্দ্রনাথকে সাথে নিয়ে আসেন পতিসরে। আমেরিকা থেকে কৃষিতে স্নাতক ডিগ্রি প্রাপ্ত এই পুত্রকে জমিদারির সাথে পরিচিত করানোর জন্যই সাথে এনেছিলেন। এই যাত্রায় কবি কালিগ্রামে কিছু নজরানাও পেয়েছিলেন। যার উল্লেখ আছে রবীন্দ্রভবনে রক্ষিত ক্যাশবইতে। প্রশান্ত পাল জানিয়েছেন—'কবি কলকাতায় পৌঁছে জমা করেন নগদ ৯৯, গিনি ১ থান ১৫।'[১২] এ যাত্রায় কবি ১২ অগ্রহায়ণ গোয়ালন্দ হয়ে কলকাতায় ফিরে যান। যাত্রাকালের বিবরণ দিয়ে পুত্র রথীন্দ্রনাথ জানিয়েছেন—'কালিগ্রাম থেকে আমরা বোটে করেই আবার ফিরে এলুম। বাবাকে কাল গোয়ালন্দে নামিয়ে রেখে এলুম; তিনি সেখান থেকে ট্রেনে কলকাতায় চলে গেলেন। কেননা পরশু তাঁকে সেখানে একটা বক্তৃতা দিতে হবে।'[১৩] কবির পতিসরে আবার আসবার কথা ছিল একই বছর চৈত্রমাসে, কিন্তু আসা হয় নি। না আসতে পারার কারণে জানকীনাথকে চিঠি পাঠিয়ে শিলাইদহে ডেকে নেন। সেখানে জানকীনাথ ও এস্টেটের অপর কর্মচারী সত্যকুমারকে সমস্ত দায়ভার চুকিয়ে দিয়ে কলকাতায় ফিরে যান।

এরপর ১৩১৭ বঙ্গাব্দে নদীপথে পুত্রসহ কবি পতিসরে আসেন ৬ ভাদ্র তারিখে। এ যাত্রায় পতিসরে আগমনকালে নদী পথের বর্ণনা দিয়ে ক্ষিতিমোহনকে একটি চিঠি লেখন। চিঠির বর্ণনাটি এমন—

> 'জলে চারিদিকে ভেসে গেছে, মাঠে-ঘাটে ঘুরে বেড়াচ্ছি। কাজ কর্ম্মের কথা সমস্তই মিথ্যে-আসল বোধ হয় এতদিনে আপনারা পেয়ে থাকবেন—ভরা ভাদ্রের গোপন চিঠি আমার মাঠের মধ্যে দিয়ে পৌঁছেছিল, তাই আমাকে ডাঙ্গা থেকে জলে টেনে এনেছে—এই কুল ডোবানো নদীর কিনারায় ধানের ক্ষেতের সবুজ ফরাসের উপর শরতের নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে এসেছি—এখনো তৃপ্তি হয়নি—অনেক দূরে অনেক কালের মত চলে যেতে ইচ্ছে করছে—কিন্তু আমার সাহেব এখনো ছুটি দিচ্ছে না।'[১৪]

রবীন্দ্রভবনে রক্ষিত ক্যাশ বইয়ের তথ্য থেকে জানা যায় কবি ১১ ভাদ্র কলকাতয় চলে যান। প্রকৃতি প্রেমিক রবীন্দ্রনাথ নদী পথের বর্ণনা দিয়ে আবারো জানিয়েছেন তাঁর অনুভূতির নির্যাসকে—

> ছোট্ট নদীটির মধ্যে দিয়ে আমার বোট চলেছে—সমস্ত দিন একলা রয়েছি, কারও সঙ্গে একটিমাত্র কথাও কইতে হয় নি। এখানকার নদীতে স্রোত প্রায় নেই, শৈবাল ভাসছে, তার থেকে এক রকম নতুন ধরনের সুগন্ধ আসছে। পালে অত্যন্ত মৃদুমন্দ বাতাস লেগেছে—বোট খুব আস্তে আস্তে চলেছে, জলের উপর যে একটি সুকোমল আলো পড়েছে এবং অদূরবর্তী তীরের উপর যে বিচিত্র সজীব সবুজ রঙের পর্যায় এবং নিভৃত গ্রাম্যদৃশ্য শ্রেণিবদ্ধ হয়ে দেখা দিচ্ছে তাতে আমাকে আমার অহমিকা থেকে ক্রমশই বাইরে আকর্ষণ করে আনছে, জীবনের জটিল গ্রন্থিগুলি যেন একে একে উন্মোচিত হয়ে যাচ্ছে এবং আত্মগত হৃদয়ের তীব্রতা ধীরে ধীরে শান্ত হয়ে আসছে।[১৫]

জগতকে অনন্ত বৃহৎ হিসেবে জানবার ও জগতের সাথে নিবিড় আত্মীয়তা করার উপযুক্ত ক্ষেত্র তখন কবি আবিষ্কার করে ফেলেন। কবির হৃদয়ের অনুরণন স্নায়ুর মধ্যে রী রী করে উঠে। কবির অন্তঃকরণের চির সঞ্চিত উত্তাপ গভীর আনন্দে সঞ্চরণ লাভ করে।

১৩১৮ বঙ্গাব্দের ২৭ পৌষ (১২ জানুয়ারি ১৯১২) রবীন্দ্রনাথ কলকাতা থেকে রেলপথে আত্রাই হয়ে পতিসরে আসেন। এ যাত্রায় তিনি লেখালেখি ও জমিদারি তদারকির কাজ নিয়ে অত্যন্ত ব্যস্ত ছিলেন। এ সময় তিনি 'পিতার বোধ' ও 'ধর্মের নবযুগ' প্রবন্ধ রচনা করেন।[১৬] 'পিতার বোধ' প্রবন্ধটি শান্তি নিকেতনে আদি-ব্রাহ্মসমাজ গৃহে প্রাতঃকালীন উপাসনায় পাঠ করেন। আর 'ধর্মের নবযুগ' প্রবন্ধটি মহর্ষিভবনে অপরাহ্নে পাঠ করেন। প্রথম প্রবন্ধটির প্রতিপাদ্য বিষয় অহং এর বিলুপ্তি ঘটিয়ে ঈশ্বররূপ পিতার বোধ অন্তরে জাগানো এবং দ্বিতীয়টির মূল বিষয় হলো ধর্মকে সংকীর্ণ করে যেন না তোলা হয়। ধর্মের প্রয়োগকে বিস্তৃতি করতে হবে। এরপর ১৩১৯ বঙ্গাব্দের ১১ জ্যৈষ্ঠ তারিখে (২৪ মে ১৯০৯) কবি তাঁর পুত্র রথীন্দ্রনাথকে নিয়ে কলকাতা থেকে বিলেত যাত্রা করেন। বিলেত থাকাকালীন সময় কালিগ্রাম পরগনা দেখাশোনার দায়িত্ব দিয়েছিলেন জামাতা নগেন্দ্রনাথকে। তখন রবীন্দ্রনাথ নগেন্দ্রনাথকে বলেছিলেন—

> এই সুযোগে জমিদারির সমস্ত কাজের ভার তোমার উপর পড়ছে। এতে আমি খুব খুশি হয়েছি। দায়িত্ব সম্পূর্ণ হাতে পেলে আপনি তোমার হাত পেকে যাবে। তুমি জমিদারির কাজটাকে কেবল উপর উপর থেকে দেখো না। ওর যত Technicalities সমস্ত বেশ ভালো করে আয়ত্ত করে নিয়ো। অর্থাৎ কোনো বিষয়েই আমলাদের মুখের কথার উপরেই যেন তোমাকে নির্ভর করতে না হয়। কাজের সমস্ত খুঁটিনাটি আয়ত্ত করতে পারলে ওর

> মধ্যে কোথায় কি পরিবর্তন ও উন্নতি সম্ভব তা তুমি ভাবতে পারবে। তাছাড়া জমিদারির বৈষয়িক অংশকেই একান্ত করে তুলবে না। তার চেয়ে বড় দিকটাকেও তুমি যদি খানিকটা এগিয়ে দিতে পার তা হলে আমি ভারি খুশি হব। কালিগ্রামে এইদিকে যথেষ্ট কাজ করার ও উন্নতি দেখাবার রাস্তা আছে। সেখানকার বিভাগীয় ম্যানেজারদের সঙ্গে তোমার সর্বদা যোগ থাকা চাই। তারা যেন তোমাকে Syampathetic বলে জানে—তাদের খুব উৎসাহ দিয়ে, তাদের হৃদয় অধিকার করে কেবল প্রভু নয়, বন্ধুর মত করে তাদের কাছ থেকে কাজ আদায় করবে।[১৭]

এরপর কবি বিলেত থেকে রওয়ানা দেন আমেরিকায়। এরপর দেশে ফেরেন নোবেল পুরস্কার বিজয়ী রবীন্দ্রনাথ হিসেবে। নোবেল পুরস্কার লাভ করার পর কলকাতায় ফিরে আসেন। এরপর পতিসরে আসেন ১৩২০ বঙ্গাব্দের ১৭ পৌষ (১ জানুয়ারি ১৯১৪ খ্রিস্টাব্দে)। তখন কালিগ্রাম পরগনার সর্বসাধারণ এক সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করে বৃহত্তর পরিসরে। বিশাল আকৃতির একটি সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে কবি রবীন্দ্রনাথকে তাঁরা উপহার দেন তাঁদেরই জমিদার বাবুর যোগ্যতার প্রাপ্যতাকে। এটিই পূর্ববঙ্গ তথা বাংলাদেশ থেকে দেয়া কবির প্রথম সংবর্ধনা অনুষ্ঠান। এরপর ১৯১৫ খ্রিস্টাব্দের জুলাই মাসের মাঝামাঝি সময়ে কবি পতিসরে আসেন। তখন কবি কিছুটা বিমর্ষ ছিলেন। কয়েকদিন থাকার পর কবির বন্ধু সি.এফ.এন্ড্রুজকে একটি পত্র লেখেন। সেই পত্রে কিছুটা হতাশা ভাব প্রকাশ পায়। পতিসর থেকে সেবার কবি শিলাইদহ হয়ে ২৯ জুলাই কলকাতায় পৌঁছেন।

কবি আবার পতিসরে আসেন ১৯১৭ খ্রিস্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসের শেষ সপ্তাহে। এই সময় কাদম্বিনী দেবীকে লেখা একটি পত্রের মাধ্যমে জানা যায় যে, কবি তখন ভীষণভাবে মানসিক যন্ত্রণায় দিনাতিপাত করছিলেন। কবি প্রায় তিন সপ্তাহ পতিসরে ছিলেন মর্মে তথ্য পাওয়া যায়। এরপর শেষবার কবি পতিসরে এসেছিলেন ১৯৩৭ খ্রিস্টাব্দের ২৬ জুলাই।[১৮] এই আগমনের উপলক্ষ ছিল জমিদারির পুণ্যাহ অনুষ্ঠান ও প্রজাদের অনুরোধে শেষবারের মতো দেখা করা। শেষবারে কবির সাথে এসেছিলেন কবির সম্বন্ধী নগেন্দ্রনাথ চৌধুরী ও সচিব সুকান্ত রায় চৌধুরী। কলকাতার শিয়ালদহ স্টেশন থেকে রেলপথে আত্রাই আসেন। সেখান থেকে মুষলধারে প্রবাহিত হওয়া বৃষ্টির মধ্যে রাত্রি ১০টায় নাগর নদীতে নৌকাযোগে রওয়ানা হয়ে পতিসরে পৌঁছেন রাত ১১টায়। পরের দিন বুধবার ছিল পুণ্যাহ অনুষ্ঠান। এই অনুষ্ঠানের বর্ণনা সম্বলিত বিবরণ—

> বুধবার ঠাকুর এস্টেটের পুণ্যাহ। সেই জন্য কাচারিতে আজ বেশ ধুমধামের আয়োজন চলছে। সকাল বেলায় আকাশও ঐ উৎসবে যোগ দিতে কৃপা করল না। সে দিনকার প্রভাত বেশ উজ্জ্বলই ছিল, কিন্তু বেলা বারোটার পূর্বেই কাচারিতে বিস্তর প্রজার ভিড় হল পূণ্যাহের জন্য নয়, রবীন্দ্রনাথকে দেখবার জন্যই বেশি।' এই সময় একদল প্রবীণ মুসলমান প্রজা এসে রবীন্দ্রনাথকে জানালে যে তাকে অন্ততঃ কিছুক্ষণের জন্য পুণ্যাহের সভায় উপস্থিত হতেই হবে। বিশেষ কায়িক অসুবিধা সত্ত্বেও রবীন্দ্রনাথ রাজী হলেন। কিন্তু তখনি পুণ্যাহ ক্ষেত্রে না গিয়ে, স্থানীয় বিদ্যালয়টি পরিদর্শন করবার পরে পুণ্যাহ স্থলে যাবার প্রস্তাব হল। রবীন্দ্রনাথের পালকী চলল গেঁয়ো পথের সরু লাইন ধরে, এ বাড়ির ও বাড়ির আনাচ-কানাচ দিয়ে বিদ্যালয়ের প্রাঙ্গণের দিকে, আর পালকীর সামনে

> পিছনে চলার লোকের ভিড়। পালকী এসে থামল 'রথীন্দ্র বিদ্যালয়ে'র উঠানে। সেখানকার একটি সভামণ্ডপের নিচে একটি ইজি চেয়ারে রবীন্দ্রনাথ বসলেন। প্রধান শিক্ষক মহাশয় বিদ্যালয়ের সংক্ষিপ্ত পরিচয় কবিকে দেয়ার পর কবি সে স্থান থেকে বিদায় নেবার ঠিক পূর্ব্বে মুহূর্ত্তে এবদল বালক ছাত্র তাঁকে প্রণাম করে তাঁর আগমন উপলক্ষ করে সাত দিনের ছুটি চাইলে রবীন্দ্রনাথ ছুটি মঞ্জুর করে দিলেন। এই মঞ্জুরীতে শিক্ষকদেরও বদনমণ্ডলে আনন্দ ফুটে উঠেছিল।[১৯]

কবিকে দীর্ঘদিন কাছে পেয়ে প্রজারা উৎফুল্ল হয়ে উঠেন। এবার কবির কাছে কোনো অভিযোগ নেই বরং কবিকে পেয়েই তারা আনন্দিত। প্রজাদের পক্ষ থেকে রাতোয়ালের কফিল উদ্দীন আকন্দ কবিকে একটি মুদ্রিত শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করেন। এভাবেই কবির পতিসর জীবনের দিনগুলো সম্পর্কে অবগত হওয়া যায়। কবির অন্যতম সচিব সুধাকান্ত রায় প্রজাদের অনুভূতি সম্পর্কে জানিয়েছেন-

> এদের কথাবার্ত্তার ভিতর দিয়ে বারবার একটি প্রার্থনাই বেজে উঠেছিল, সেটি তাঁদেরই ভাষায় বলি-'আমরা ত হুজুর বুড়ো হয়েছি, আমরা চলতি পথে, আপনিও চলতি পথে, বড়ই দুঃখ হয়, প্রজা-মনিবের এমন মধুর সম্বন্ধের ধারা বুঝি ভবিষ্যতে বন্ধ হয়ে যায়। ছেলে-পিলেদের মতিগতি বদলে যাচ্ছে, তারা আমাদের সব নাদান মনে করে-এমন জমিদারের জমিদারিতে বাস করবার সৌভাগ্যবোধ তাদের বুঝি হবে না।' এঁদের মধ্যে একজন সাশ্রু নয়নে বলে উঠলেন, হুজুর আমরা হিন্দুদের মত জন্মান্তরবাদ মানি না, মানলে খোদার কাছে এই প্রার্থনাই জানাতাম বার বার যেন হুজুরের রাজ্যেই প্রজা হয়ে জন্ম নিই। এইসব প্রজাদের অবস্থা ভাল, এঁরা কেউ কবিকে এসব কথা খোসামোদ ছলে বলেন নি, তাদের নিজের অন্নদাতা হিসেবে মনে করেন। অতীতের পুরানো কথা বলতে বলতে কবি এবং প্রজাদের চোখ ছলছল করে উঠেছে আনন্দের অশ্রুবাষ্পে। এ দৃশ্য দেখতে পাব, কোন দিন ভাবতেও পারি নি।[২০]

পুণ্যাহ অনুষ্ঠানের পরের দিন ২৭ জুলাই সকাল বেলা একটি ছেলে আসে কবির সাথে দেখা করার জন্য। ছেলেটির হাতে ছিল একখণ্ড কাগজ। কাগজটি কবির হাতে দিয়ে ছেলেটি কবিকে কিছু লেখার জন্য অনুরোধ করে। কবি তখন ছেলেটির কাগজে লিখে দেন। লেখাটি হলো-

> সীমাশুন্য মহাকাশে দৃপ্ত বেগে চন্দ্রসূর্য্য তারা
> যে প্রদীপ্ত শক্তি নিয়ে যুগে যুগে চলে ক্লান্তিহারা,
> মানবের ইতিবৃত্তে সেই দীপ্তি লয়ে, নরোত্তম,
> তোমরা চলেছ নিত্য মৃত্যুরে করিয়া অতিক্রম।[২১]

বিকেল বেলা দলে দলে মানুষ আসতে থাকে কবিকে শ্রদ্ধা নিবেদন জানাতে। কবিও সবার কাছে বিদায় চান। তখন অধিকাংশ প্রজাই তাঁদের প্রিয় জমিদার বাবুর বিদায়কালে অশ্রু ধরে রাখতে পারে নি। বিদায় নিয়ে আত্রাই স্টেশনে পৌঁছালে কবির সাথে দেখা করতে আসেন তৎকালীন রাজশাহীর জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ও খ্যাতনামা লেখক অন্নদাশঙ্কর রায়। এ বিষয়ে অন্নদাশঙ্কর রায়ের বর্ণনাটি এমন—

> আমি রাজশাহী জেলার কালেক্টরেট পদে বদলি হয়ে যাই। হঠাৎ এক টেলিগ্রাম পাই। রবীন্দ্রনাথ আজ আত্রাই ঘাটে অবতরণ করবেন আমার উপস্থিতি প্রত্যাশা করেন। আমি তৎক্ষণাৎ রওনা হয়ে যাই। মোটরে নাটোর। নাটোর থেকে ট্রেনে আত্রাই ঘাট স্টেশন।

> ট্রেন থেকে নেমে দেখি কবিও বোটে থেকে নামতে যাচ্ছেন। বোটে উঠে প্রণাম করি। তারপর তাঁর সঙ্গে স্টেশনের প্লাটফর্মে যাই ও পাশাপাশি দুখানা চেয়ারে বসে কলকাতাগামী ট্রেনের জন্য অপেক্ষা করি। তাঁর বোটের সঙ্গে একদল প্রজা, সমস্ত পথ পায়ে হেঁটে পতিসর থেকে এসেছিল তাঁকে শেষবারের মতো বিদায় দিতে। তাঁর কাছ থেকে বিদায় নিতে। আর কখনো দর্শন পাবে না বলে তাদের চোখে জল। বেশির ভাগই দাঁড়িওয়ালা বুড়ো মুসলমান, ওরা বলে পয়গম্বরকে আমারা দেখিনি। হুজুরকে দেখলুম আমাদের কী ভাগ্য![২২]

কবির সাথে অন্নদাশঙ্কর রায় নাটোর পর্যন্ত ট্রেনে এসেছিলেন একই কামরায়। সেখানে তাঁর সাথে কবির সাহিত্য নিয়ে অনেক আলোচনা হয়। তিনি ট্রেন থেকে নেমে যান নাটোরে। কবি অন্নদাশঙ্কর রায়কে বিশেষ একটি কারণে ডেকেছিলেন। কারণটি হলো কবির পতিসরের ম্যানেজারকে যেন প্রথম শ্রেণির অনারারি ম্যাজিস্ট্রেট করা হয়। শেষ পর্যন্ত পদটির জন্য দ্বিতীয় শ্রেণির অনারারি ম্যাজিস্ট্রেট হিসেবে সুপারিশ করা হয়। কবি কলকাতায় গিয়ে অন্নদাশঙ্কর বাবুর জন্য একটি বই উপহার স্বরূপ পাঠিয়েছিলেন।

জমিদারির দায়িত্ব নিয়ে কবি ১৮৮৯ খ্রিস্টাব্দের নভেম্বর মাসে স্ত্রী, পুত্র, কন্যাসহ বাংলাদেশের শিলাইদহে আগমন করেন। কলকাতার জোড়াসাঁকোর ঠাকুর পরিবারের বাংলাদেশে তিনটি জমিদারি ছিল। এর মধ্যে ভাগ-বাটোয়ারার সূত্রে রবীন্দ্রনাথের ভাগে পড়ে কালীগ্রাম পরগনা। নওগাঁ ও বগুড়া জেলার ছয়শত গ্রাম নিয়ে কালীগ্রাম পরগনা গঠিত। এর আয়তন ছিল ২৩০ বর্গমাইল।[২৩] এই অনুন্নত পরগনার উন্নতি কল্পে কবি রাস্তা-ঘাট, শিক্ষা ব্যবস্থা, স্বাস্থ্যসেবা ও দারিদ্র্য বিমোচনসহ নানা কর্মসূচি হাতে নিয়েছিলেন। কর্মসূচির মধ্যে ছিল গ্রামে গ্রামে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কৃষি, শিল্প, ব্যাংক স্থাপন, রাস্তাঘাট নির্মাণ, কূপ খনন, দিঘি ও পুকুর খনন, জঙ্গল পরিষ্কার, গ্রাম্য শালিশী ব্যবস্থা ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। এসব কর্মসূচি সঠিকভাবে বাস্তবায়নের জন্য তিনি কালীগ্রাম পরগনাকে তিনটি বিভাগে ভাগ করেছিলেন। 'কালীগ্রাম হিতৈষী সভা'[২৪] নামেও একটি সংগঠন তিনি তৈরি করেছিলেন। এই কালীগ্রামকে তিনি 'পল্লি উন্নয়নের মডেল' হিসেবে দাঁড় করতে চেয়েছিলেন।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কালীগ্রাম পরগনার অন্যান্য উন্নয়নের পাশাপাশি শিক্ষা বিস্তারের দিকেও গুরুত্ব দিয়েছিলেন। শিক্ষা বিস্তারের কার্যক্রমের অংশ হিসেবে বিশেষভাবে পরগনায় মূক ও মূঢ় মানুষদের জন্য তিনি গ্রামে গ্রামে অবৈতনিক পাঠশালা চালু করেছিলেন। পরগনার ছয়শত গ্রামের মানুষ এই সুবিধা যেন পান তারও ব্যবস্থা তিনি গ্রহণ করেছিলেন। পতিসর, কামতা ও রাতোয়াল গ্রামে তিনটি ইংরেজি (এম. ই) স্কুল স্থাপন করেছিলেন।[২৫] স্কুলের ভবন, ছাত্রাবাস নির্মাণ ও অন্যান্য খরচ এস্টেট থেকে বহন করা হতো। পরবর্তীতে এই তিনটি বিদ্যালয় হাইস্কুলে রূপান্তরিত হয়েছে। এর মধ্যে পতিসরে অবস্থিত কবির পুত্রের নামানুসারে একটি হাইস্কুল প্রতিষ্ঠা করা হয় ১৯৩৭ সালের ২৬ জুলাই। প্রতিষ্ঠানটির নামকরণ করা হয় কালীগ্রাম রথীন্দ্রনাথ ইন্সটিটিউট। প্রতিষ্ঠানটি স্থাপিত হওয়ার পর এর ব্যয়ভার ও পরিচালনার জন্য কবি প্রায় ৫৪.৬১ একর জমি দান করেন। প্রতিষ্ঠানটি তার আগে এম. ই (মিডিয়াম অফ ইংলিশ) স্কুল ছিল। স্কুলে দুটি হোস্টেল ছিল। একটি মুসলিম হোস্টেল এবং অপরটি হিন্দু হোস্টেল। আত্রাই, রাণীনগর, নন্দীগ্রাম ও সিংড়া উপজেলার

শত শত ছাত্র-ছাত্রী এ স্কুলে বিদ্যাশিক্ষা অর্জন করতেন। বর্তমানে এই স্কুলের অসংখ্য ছাত্র-ছাত্রী রাষ্ট্রের বিশিষ্টজন হিসেবে কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখে চলেছেন। ১৯১৩ খ্রিস্টাব্দের জানুয়ারি মাসে[২৬] *রাতোয়াল* গ্রামে আরেকটি বিদ্যালয় স্থাপন করা হয়। প্রথমে এ বিদ্যালয়ের নাম ছিল রাতোয়াল এম. ই. স্কুল। এই বিদ্যালয়টিরও প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। পরবর্তীতে এই প্রতিষ্ঠানটি হাইস্কুলে রূপান্তরিত হয়েছে। কবির নিজের নামে এই স্কুলটির নামকরণ করা হয় 'রাতোয়াল বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ উচ্চ বিদ্যালয়'। বিদ্যালয়টির প্রধান শিক্ষক হিসেবে আত্রাই উপজেলার গুরনয় গ্রামের শ্রী কেশবচন্দ্র সরকারকে নিয়োগ দেয়া হয়েছিল। ১৯১৩ খ্রিস্টাব্দের জানুয়ারি মাসে পরগনার *কামতা* গ্রামে আর একটি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা হয়।[২৭] প্রথমে বিদ্যালয়টির নামকরণ করা হয়েছিল কামতা এম. ই. স্কুল। পরবর্তীতে এর নামকরণ করা হয় কবির ভ্রাতার নামানুসারে 'কামতা সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর (এস.এন) উচ্চ বিদ্যালয়'। এই প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতাও ছিলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। বাবু সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর স্কুলটিতে ১.৯৪ একর জমি দান করেন। ১৯৬৮ খ্রিস্টাব্দে বিদ্যালয়টিকে হাইস্কুলে রূপান্তরিত করা হয়। এই স্কুলের প্রধান শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ দেয়া হয়েছিল কামতা গ্রামের মো: মোজাম্মেল হক-কে (বি.এ. বিটি)।

তিনি নিজ জমিদারি এলাকার বাইরেও বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সার্বিক কল্যাণের নিমিত্তে সব সময় খোঁজ-খবর রাখতেন। এরই প্রমাণ স্বরূপ কালীগ্রাম পরগনার অদূরে বগুড়া জেলার দুপচাঁচিয়া হাইস্কুলে ১৯১৭ সালের ২৭ জুলাই নিজ হাতে লেখা একটি আশীর্বাণী প্রেরণ করেন। আশীর্বাণীতে তিনি লিখেছেন—'দেশে জ্ঞানের অভিষেচন কার্য্যে দুপচাঁচিয়া হাইস্কুল অন্যতম কেন্দ্র রূপে যে সাধনায় প্রবৃত্ত তাহাতে তাহার সফলতা আমি কামনা করি।'[২৮] এমন কথার মধ্য দিয়ে প্রমাণ করে যে, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর একজন প্রকৃত অর্থেই শিক্ষানুরাগী মানুষ ছিলেন। বর্তমানেও এ পরগনায় রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাসহ অন্যান্য ক্ষেত্রে যে অবদান তা শ্রদ্ধার সাথে স্মরণীয়। তাঁর তৈরি রাস্তা-ঘাট, ডাক্তারখানা, তহশিল অফিস, পোস্ট অফিস, কূপ, দিঘি ও পুকুর সবই রয়েছে স্বাভাবিক অবস্থায়। তাঁর তৈরিকৃত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো আজো ঐতিহ্যমণ্ডিত হয়ে আছে। সুনামের সাথে শিক্ষা বিস্তারের কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পালন করে আসছে। পতিসরে বর্তমানে রবীন্দ্রনাথের 'কৃষি ও সমবায় ব্যাংকে'র পরিবর্তে 'রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংকে'র শাখা স্থাপিত হয়েছে। মূলত পতিসরে এসব প্রতিষ্ঠিত হয়েছে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্মৃতি ধরে রাখার জন্য।

তিনি এখানে এসে নদীমাতৃক গ্রাম-বাংলার বিশুদ্ধ রূপ দেখে একদিকে যেমন মুগ্ধ হয়ে পড়েন, তেমনি অপরদিকে হয়ে পড়েন ভাবনায় মুখরিত। কবির ভাষায়—'মাতৃভাষার যথার্থ স্বরূপ গ্রামেই। এই এখানেই প্রাণের নিকেতন। লক্ষ্মী এইখানেই তাঁহার আসন সন্ধান করেন।'[২৯] গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর মধ্যে দারিদ্র্য, অশিক্ষা, অস্বাস্থ্য সর্বোপরি দুস্থ জীবন যাত্রার দৃশ্য ও ছবি দেখে তিনি রীতিমতো বিচলিত হয়ে পড়েন। ফলে তাঁর মনের ভাবনা ও চিন্তায় এসে পড়ে আকস্মিক পরিবর্তন। প্রকৃতির সৌন্দর্যে মুগ্ধ ও অভিভূত কবি রবীন্দ্রনাথ নিতান্তই বিচলিত না হয়ে পারলেন না। সংবেদনশীল মনে জাগ্রত হয় মানবতাবাদের। কবির ভাষায় তা শোনা যাক-

> 'আহা, এমন প্রজা আমি দেখি নি- এদের অকৃত্রিম ভালোবাসা এবং এদের অসহ্য কষ্ট দেখলে আমার চোখে জল আসে। আমার কাছে এই- সমস্ত দুঃখ পীড়িত অটল বিশ্বাসপরায়ণ অনুরক্ত ভক্ত প্রজাদের মুখে এমন একটি কোমল মাধুর্য আছে, এদের দিকে চেয়ে এবং এদের কথা শুনে সত্যি সত্যি বাৎসল্যে আমার মন বিগলিত হয়ে যায়। বাস্তবিক, এরা যেন আমার একটি দেশ জোড়া বৃহৎ পরিবারের লোক। এই-সমস্ত নিঃসহায় নিরুপায় নিতান্ত নির্ভরপর সরল চাষা-ভূষোদের আপনার মনে করতে বড় একটা সুখ আছে। এদের ভাষা শুনতে আমার এমন মিষ্টি লাগে—তার ভিতর এমন স্নেহমিশ্রিত করুণা আছে!'[৩০]

তিনি পতিসরে এসে সাধারণ মানুষের মুক্তির প্রত্যাশায় উদ্‌গ্রীব হয়ে পড়েন। শুধু তাই নয়, সেইসাথে তাঁর অন্তরেও স্থান পায় পল্লিভাবনা ও সমাজউন্নয়ন।

পল্লি উন্নয়ন ও পল্লি পুনর্গঠন নিয়েও ভাবতে থাকেন কবি রবীন্দ্রনাথ। দরিদ্র কৃষক আর শ্রমজীবী মানুষ তাঁর ভাবনার বিষয় হিসেবে উঠে আসে এই পতিসরের স্বল্প বিস্তর ক্যানভাসে। তখন কৃষক আর শ্রমজীবী মানুষের বড় সমস্যা ছিল মহাজনী ঋণের। জমিদার রবীন্দ্রনাথ জানতেন মহাজনী ঋণের মার-প্যাচের খপ্পরে পড়ে দরিদ্র কৃষকদের সর্বস্বান্ত হতে হয়। দারিদ্র্যকে দূর করার জন্য তিনি কালিগ্রামে স্থাপন করেন 'কৃষি সমবায় ব্যাংক'।[৩১] ১৯০৫ সালে প্রতিষ্ঠিত এই ব্যাংকটি গরীব কৃষক, কৃষিজীবী, আর অন্যান্যদের মাঝে সহজ শর্তে ঋণ দিতে শুরু করেছিল ।[৩২] ১৯১৩ খ্রিস্টাব্দে পাওয়া নোবেল পুরস্কারের ১ লাখ ৮ হাজার টাকা রবীন্দ্রনাথ ঐ নবগঠিত 'কৃষি সমবায় ব্যাংকে' জমা রাখেন। প্রায় ২০ বছরের অধিক সময় ধরে এই ব্যাংকটি চালু ছিল।[৩৩] কৃষক প্রজারা যখন খাজনার ভারে জর্জরিত, দারিদ্র্যের কষাঘাতে নিষ্পেষিত, তখন তিনি তাদের খাজনা মাফ করে দিয়েছিলেন। সুদখোর মহাজনদের হাত থেকে এই অঞ্চলের কৃষক সমাজকে রক্ষা করার জন্য সুদমুক্ত ঋণ প্রদানের ব্যবস্থাও করেছিলেন। যা সহজ শর্তে কৃষকরা পেয়ে যেতেন। কৃষির সার্বিক উন্নতির জন্য যান্ত্রিক পদ্ধতির চাষাবাদ ব্যবস্থাও প্রবর্তন করেন। জানা যায়-পতিসরে সর্বপ্রথম তিনিই কলের লাঙলের মাধ্যমে যান্ত্রিক পদ্ধতির চাষাবাদ প্রবর্তন করেছিলেন।[৩৪] কবির প্রিয় পুত্র রথীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে আমেরিকার ইলিনয় বিশ্ববিদ্যালয় থেকে কৃষিতে উচ্চতর ডিগ্রি অর্জন করানোর পর পতিসরের কৃষির উন্নয়নের জন্য প্রিয়পুত্রকে নিয়োগ দিয়েছিলেন। রথীন্দ্রনাথও ভালোবেসেছিলেন পূর্ববাংলার সবুজ-শ্যামল প্রকৃতি আর মানুষগুলোকে। ফলে কালিগ্রাম হয়ে ওঠে মহাজনের শোষণমুক্ত অঞ্চল। পতিসর তথা কালিগ্রাম পরগনা এভাবেই রবীন্দ্রনাথের কাছে চির ঋণী।

উত্তর জনপদের ছোট একটি গ্রাম পতিসর। এই অঞ্চলের সাথে রবীন্দ্রনাথের প্রধান পরিচয় জমিদার বাবু হিসেবে। জমিদার, মানুষ ও কবি এই তিনটির সমন্বয়ে রবীন্দ্রনাথের যে ব্যক্তিসত্তা তার প্রকৃত পরিচয় পাওয়া যায় পতিসরে।[৩৫] তবে ছোট হলেও গ্রামটির পরিচয় দেশব্যাপী আজ সুপরিচিতি লাভ করেছে কেবলমাত্র কবির কারণে। এই পতিসরে খাজনা আদায়ের জন্য রবীন্দ্রনাথ সুদূর কলকাতা থেকে এসেছিলেন। পতিসরের নাগর নদীর তীরে ছিল কাচারি বাড়িটির অবস্থান। এখানকার প্রকৃতি ও নাগর নদীটি রবীন্দ্রনাথের কাছে ছিল এক অন্য পৃথিবী। কবির ভাষায়-

> ছোট্ট একটি নদী আছে বটে, কিন্তু তাতে কানা কড়ির স্রোত নেই। সে যেন আপন শৈবালদামের মধ্যে জড়ীভূত হয়ে অঙ্গ বিস্তার করে দিয়ে পড়ে ভাবছে যে, যদি না চললেও চলে তবে আর চলার দরকার কী? জলের মাঝে মাঝে যে লম্বা ঘাস এবং জলজ উদ্ভিদ জন্মেছে, জেলেরা জাল ফেলতে না এলে সেগুলো সমস্ত দিনের মধ্যে একটু নাড়া পায় না। পাঁচটা-ছটা বড়ো বড়ো নৌকা সারি সারি বাঁধা আছে। তার মধ্যে একটার ছাদের উপর একজন মাঝি আপাদমস্তক কাপড়ে মুড়ে রোদদুরে নিদ্রা দিচ্ছে। আর একটার উপর একজন বসে বসে দড়ি পাকাচ্ছে এবং রোদ পোহাচ্ছে। দাঁড়ের কাছে একজন আধবৃদ্ধ লোক অনাবৃত গাত্রে বসে অকারণে আমাদের বোটের দিকে চেয়ে আছে। ডাঙার উপরে নানান রকমের নানান লোক অত্যন্ত মৃদুমন্দ অলস চালে কেন যে আসছে, কেন যে যাচ্ছে, কেন যে বুকের মধ্যে নিজের দুটো হাঁটুকে আলিঙ্গন করে ধরে উবু হয়ে বসে আছে, কেন যে অবাক হয়ে বিশেষ কোনো কিছুর দিকে না তাকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, তার কোনো অর্থ পাওয়া যায় না। কেবল গোটা কতক পাতি হাঁসের ওরই মধ্যে একটু ব্যস্ত ভাব দেখা যাচ্ছে। তারা ভারী কলরব করছে এবং ক্রমাগতই উৎসাহ সহকারে জলের মধ্যে মাথা ডুবোচ্ছে এবং তৎক্ষণাৎ মাথা তুলে নিয়ে সবলে ঝাড়া দিচ্ছে।[৩৬]

সান বাঁধানো ঘাট ছিল এই নাগর নদীর তীরে। তার দুটিধারে ছিল পাকা গাঁথুনির হেলানো ব্রেঞ্চ। ঘাটের পূর্ব দিকে ছিল একটি বিশাল ঝাউ গাছ। প্রধান গেটের দক্ষিণ-পশ্চিমে যে ছোট দিঘি আছে তার নাম রবীন্দ্র সরোবর। এর সান বাঁধানো ঘাটে বসে আমলা কর্মচারী, শিক্ষক ও গণ্যমান্য প্রজাগণ আসর বসায়ে রাত কাটাতেন।

রবীন্দ্র সরোবরের পশ্চিম পাড়ে ছিল একটি ডাকঘর, একটি ছাত্রাবাস এবং কাচারির মুনশি বাবুর বসত বাড়ি। কাচারির সিংহ দ্বারের পাশের ঘরে ছিল চিফ ম্যানেজারের অফিস ও অতিথি ভবন। তার পাশে বসে মহুরিরা খাজনা আদায় করতেন। জানা যায় এই কাচারি বাড়ির দালানের পশ্চিম দিকে ছোট বড় মিলে মোট ১৭টি ঘর ছিল। বাইর থেকে আগত কর্মচারী, স্কুলের ছাত্র-শিক্ষক, স্থানীয় দাতব্য চিকিৎসালয়ের ডাক্তার এবং কিছু চতুর্থ শ্রেণির কর্মচারীরা এসব ঘরে বাস করতেন। এখানে বিকেলে ভলিবল, দাড়িয়া বান্ধা, হাডুডু ইত্যাদি খেলা অনুষ্ঠিত হতো। কাচারি বাড়ির পাশে ছিল একটি দিঘি। দিঘিটি কাজের বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচির অধীনে খনন করা হয়েছিল। যার ফলে বহু নিরন্ন অভাবী প্রজা খাদ্যের অভাব থেকে মুক্তি পেয়েছিলেন। প্রাণ চাঞ্চল্যে ভরা এই কাচারি বাড়িটি সকাল থেকে রাত্রি পর্যন্ত বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে মুখরিত থাকতো। এই কাচারি বাড়িটিতে যে সব উৎসব পালন হতো সেগুলোর মধ্যে ছিল পহেলা বৈশাখ, পুণ্যাহ অনুষ্ঠান ও হালখাতা অন্যতম। হালখাতার দিনে প্রজাগণ খাজনা পরিশোধ করে দধি, চিড়া ও মিষ্টি খেয়ে বাড়ি ফিরতেন। পতিসরের দ্বিতীয় উৎসব ছিল ২৫ বৈশাখ অর্থাৎ কবির জন্মদিন। সারাদিন ধরে জন্ম উৎসব পালিত হতো। প্রভাতে প্রভাত ফেরি বের হতো। প্রভাত ফেরিটি সিংহদ্বার থেকে বাদ্য বাজনাসহ যাত্রা শুরু করে 'আমার মাথা নত করে দাও হে তোমার চরণ ধুলি তলে' গান গেয়ে গ্রাম প্রদক্ষিণ শেষে আবার সিংহদ্বারে এসে শেষ হতো। এতে স্কুলের ছাত্র-শিক্ষক, আমলা, কর্মচারী, সাধারণ প্রজা সবাই অংশ গ্রহণ করতো। সিংহদ্বারের পিছনে রাখা হতো কবির প্রতিকৃতি। প্রতিকৃতিতে প্রদান করা হতো মাল্য ও পুষ্প। কবির জন্মদিনে বা কোনো সময় রাতোয়ালের বড় জোতদার আকবর আলী আকন্দ সাহেব বিখ্যাত লাঠিয়াল দল পাঠিয়ে কবি

গুরুর মনোরঞ্জন করতেন। কবি গুরু লাঠিয়ালদের লাঠিখেলা খুব আনন্দের সাথে উপভোগ করতেন। পতিসরে ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, নমঃশুদ্র, হিন্দু, মুসলমান প্রভৃতি ধর্ম ও গোত্রের মানুষ বাস করতেন। কাচারি বাড়ির সন্নিকটে ছিল বাসুদেবের প্রস্থরময় মূর্তি সুশোভিত মুণী ঠাকুরের মন্দির। এই মন্দিরে প্রতিদিন পূজা উপলক্ষে রাজভোগ দেওয়া হতো। পতিসরকে বাদ দিয়ে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে চিন্তা করা যায় না। বর্তমানে এখানে 'রবীন্দ্রনাথ কৃষি প্রযুক্তি ইন্সটিটিউট' ও 'আন্তর্জাতিক রবীন্দ্র গবেষণা ইন্সটিটিউট' নামে দুটি প্রতিষ্ঠান স্থাপন করা হয়েছে। এখানে রবীন্দ্রনাথের সমকালে একটি দাতব্য চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল। প্রতিষ্ঠানটি কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ নিজেই প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। কাচারির প্রজা হিতৈষী ফাণ্ড থেকে এর ব্যয়ভার নির্বাহ করা হতো।

কবির শেষ আগমন ঘটেছিল ২৭ জুলাই ১৯৩৭ খ্রিস্টাব্দে, বাংলা ১৩৪০ সালের ১২ শ্রাবণ। মূলত তিনি এসেছিলেন প্রজাদের অনুরোধে তাদের সাথে শেষ দেখা করার জন্য। অসুস্থ কবি আত্রাই রেলস্টেশন থেকে বোটে করে পতিসরে পৌঁছেন। কবির শেষ আগমনকালে সংবর্ধনার আয়োজনের কোনো ত্রুটিও ছিল না। রাতোয়াল গ্রামের বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব কফিল উদ্দিন আকন্দের রবীন্দ্র প্রশস্তিসূচক মানপত্র পাঠের জবাবে রবীন্দ্রনাথ আবেগ তাড়িত কণ্ঠে বলেছিলেন- 'সংসার থেকে বিদায় নেবার আগে ইচ্ছা ছিল তোমাদের দেখে যাবো, আজ সেই ইচ্ছা পূর্ণ হলো। তোমরা এগিয়ে চল। সবার আগে চাই জনগণের জন্য শিক্ষা। তোমাদের কাছে অনেক পেয়েছি, বিনিময়ে কি দিতে পেরেছি জানি না। তবে আমার ভালোবাসা রইল তোমাদের জন্য।'[৩৭] কালিগ্রামের মানুষ বিশেষ করে কৃষক-জনতা রবীন্দ্রনাথের শেষ যাত্রায় তাঁর ভালোবাসার প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাতে বিন্দুমাত্র কৃপণতা প্রদর্শন করেন নি। নাগর নদী হয়ে বোটে আত্রাইয়ের পথে রবীন্দ্রনাথের বিদায় যাত্রায় নদীর দুধারে দাঁড়ানো হাজারো মানুষ তাঁর সঙ্গী। এসব মানুষের অধিকাংশই কৃষক ও শ্রমজীবী। আত্রাই স্টেশনে পৌঁছেও রবীন্দ্রনাথ দেখেন তাঁর পনগনার শ'খানেক মানুষ তাদের প্রিয় মানুষটিকে বিদায় জানানোর জন্য উপস্থিত হয়েছেন। তাদের সবার চোখে অশ্রুকণা অঝোরে ঝরে পড়ছে। বিদায়ের প্রাক্কালে রবীন্দ্রনাথ কৃষকসমাজ ও কালিগ্রামের মুসলমান প্রজাদের সম্পর্কে তাঁর ধারণা ব্যক্ত করেছেন এভাবে- 'মুসলমান কৃষকসমাজ দেশের মাটির প্রতি বিশ্বস্ত। সদব্যবহার পেলে ভালোবাসার বিনিময়ে ভালোবাসা জানাতে তারা জানে।'[৩৮]

পতিসরে বসবাস করার সময় এখানকার প্রাকৃতিক দৃশ্যের বর্ণনা ও সৌন্দর্যের কথা রবীন্দ্রনাথ তাঁর *ছিন্ন পত্রাবলী* গ্রন্থের ১১৪ সংখ্যক পত্রে লিখে জানিয়েছেন—

> মাঝে মাঝে মেঘ করছে, মাঝে মাঝে পরিষ্কার হয়ে যাচ্ছে। থেকে থেকে হঠাৎ হুহু করে একটা হাওয়া এসে আমার বোটের গ্রন্থিতে গ্রন্থিতে বিচিত্র ক্যাঁ-কোঁঃ শব্দে আর্তনাদ তুলছে আজ—দুপুর বেলাটা এমনিভাবে চলছে। এখন বেলা একটা বেজেছে-তোরা যথানিয়মে আহারাদি করে হিসেব পত্র দেখে এতক্ষণ বোধ হয় রুদ্ধদ্বার শয়নালয়ে নিদ্রা দিতে গেছিস। পাড়া গাঁয়ে মধ্যাহ্নের এই হাঁসের ডাক, পাখির ডাক, কাপড় কাচার শব্দ, নৌকো-চলা, জলের ছল্ ছল্ ধ্বনি, দূরে গোরুর পাল পার করবার হৈহৈ রব এবং আপনার মনের ভিতরকার একটা উদাস আলস্যপূর্ণ স্বগত সংগীতস্বর কলকাতার চৌকি-টেবিল-সমাকীর্ণ বর্ণ বৈচিত্র্যবিহীন নিত্য নৈমিত্তিকতার মধ্যে কল্পনাও করতে পারি নে।[৩৯]

পতিসরে বসে কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ২৬ ফেব্রুয়ারি ১৮৯৪ খ্রিস্টাব্দে প্রকৃতির যেসব বর্ণনা দিয়ে পত্রটি লিখেছিলেন তা যেন কালের ব্যবধানে আজকের বাস্তবতা ও সময়কে স্মরণ করিয়ে দেয়। প্রকৃতি প্রেমিক রবীন্দ্রনাথ প্রকৃতিকে যে কত ভালোবাসতেন তা ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভব নয়। কারণ তিনি কলকাতার বাইরে এসে যেভাবে প্রকৃতিকে স্পষ্ট করে সরাসরি দেখবার সুযোগ পেয়েছিলেন তারই বর্ণনা অত্যন্ত বাস্তবতার সাথে তুলে ধরেছেন। কবির ভাষায়-

> জ্যোৎস্না প্রতি রাত্রেই অল্প অল্প করে ফুটে উঠছে। আমি তাই আজকাল সন্ধ্যের পরেও অনেকক্ষণ বাইরে বেড়াই। নদীর এ পারের মাঠে কোথাও কোনো সীমাচিহ্ন নেই, গাছপালা নেই-চষা মাঠে একটি ঘাসও নেই। কেবল নদীর ধারের ঘাসগুলো প্রখর রৌদ্রে শুকিয়ে হলদে হয়ে এসেছে। জ্যোৎস্নায় এই ধূ ধূ শূন্য মাঠ ভারী অপূর্ব দেখতে হয়-সমুদ্র এই রকম অসীম বলে মনে হয়, কিন্তু তার একটা অবিশ্রাম গতি এবং শব্দ আছে। এই মাটির সমুদ্রের কোথাও কিছু গতি নেই, শব্দ নেই, বৈচিত্র্য নেই, প্রাণ নেই-ভারী একটা উদাস মৃত শূন্যতা। চলবার মধ্যে কেবল এক প্রান্তে আমি একটি প্রাণী চলছি এবং আমার পায়ের কাছে একটি ছায়া চলে বেড়াচ্ছে।[৪০]

পতিসরের প্রকৃতি যেমন দেখতে নির্জন ও সুন্দর, তেমনি এখানকার মানুষগুলো যেন প্রকৃতির মতোই স্বাভাবিক ও সরল। কালীগ্রাম পরগনার মানুষগুলো যে খুবই সহজ-সরল ও সাদা-সিধে ছিল সে কথাটিও রবীন্দ্রনাথ উচ্ছ্বসিত ভাষায় বলেছেন-

> 'এখানকার প্রজাদের উপর বাস্তবিক মনের স্নেহ উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে। এদের কোনোরমক কষ্ট দিতে আদবে ইচ্ছে করে না। এদের সরল ছেলে-মানুষের মতো অকৃত্রিম স্নেহের আবদার শুনলে বাস্তবিক মনটা আর্দ্র হয়ে ওঠে। যখন তুমি বলতে বলতে তুই বলে ওঠে, যখন আমাকে ধমকায়, তখন ভারী মিষ্টি লাগে। এক এক সময় আমি ওদের কথা শুনে হাসি, তাই দেখে ওরাও হাসে। সেদিন আমি সন্ধ্যের সময় বেড়াচ্ছিলুম একজন প্রজা এসে বললে 'একটু খাড়া হও তুমি'—আমি কিছু আশ্চর্য হয়ে চুপ করে দাঁড়ালুম। সে আমার পায়ের ধুলো নিয়ে বুকে মাথায় মেখে বললে—'আমার জনম সার্থক হল।'[৪১]

বিশ্বকবির যে মানবতাবোধ! মানুষকে ভালোবাসার প্রতি তাঁর যে অনন্ত আকুতি, আজীবন তিনি মিলনের জন্য যে গান গেয়েছেন তা পতিসরের মাটিতে আজো সত্য হয়ে আছে। তাই পতিসরকে রবীন্দ্র স্মৃতিবিজড়িত স্থান হিসেবে সম্মান দেখানো আপামর জনসাধারণের নৈতিক দায়িত্ব ও কর্তব্য। তা না হলে প্রকারান্তরে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও তাঁর আত্মাকেই অসম্মান ও অপমান করা হবে।

এই পতিসরের মাটিতে বসেই রবীন্দ্রনাথ তাঁর শেষ সৃষ্টি—'আকাশ প্রদীপ' কবিতাটি লিখেছেন।[৪২] আজ রবীন্দ্রনাথ নেই, তাঁর এস্টেটও নেই। তবে জনকল্যাণের জন্য তৈরি করা সব কিছুই থেকে গেছে এই পতিসরে। তালগাছ একপায়ে দাঁড়িয়ে, আমাদের ছোট নদীসহ অসংখ্য বিখ্যাত কবিতা, গান, ছিন্ন পত্রাবলী এই পতিসরে কবি রচনা করেছেন। কালের সাক্ষ্য হিসেবে এসব লেখাগুলো হৃদয় পটে গেঁথে আছে। পতিসরে কবি যেসব গ্রন্থ লিখেছেন তারও একটি তালিকা জেনে রাখার জন্য নিচে তুলে ধরা হলো—

পতিসরে রচিত কবির রচনাবলির তালিকা নিম্নরূপ:[৪৩]

চিত্রা কাব্য: পূর্ণিমা, সন্ধ্যা, চৈতালি, পল্লীগ্রামে, সামান্য লোক, দুর্লভ জন্ম, খেয়া, বনে ও

রাজ্যে, ঋতু, তপোবন, সংহার, মেঘদূত, দিদি, পরিচয়, অনন্তপথে, ক্ষণিকা।

কল্পনা কাব্য: মাতার আহবান, হতভাগ্যের গান, ভিখারী, মানস প্রতিমা, সংকোচ, প্রার্থী, সকরুণা, শরৎ।

ক্ষণিকা কাব্য: বাণিজ্য বসতে লক্ষ্মী, ছড়ার ছবি, আকাশ প্রদীপ, বিদায় অভিশাপ, কথা ও কাহিনী।

গান: বিধি ডাগর আঁখি, বধু মিছে রাগ কর না, জলে ডোবা চিকন শ্যামল, আমি কান পেতে রই, তুমি নব রূপে এসো প্রাণে, যদি বারণ কর তবে গাহিব না।

ছিন্নপত্রাবলী: ৯, ১০, ১১, ১২, ১৩, ১০৮, ১০৯, ১১০, ১১১, ১১৩, ১১৪, ১১৫, ১১৬, ১১৭, ১১৮, ১১৯, ১২০, ১৫২, ২১২, ২১৩, ২১৪, ২৪১, ২৪২, ২৪৩, ২৪৪, ২৪৬, ২৪৭ সংখ্যক চিঠি।

উপন্যাস: গোরা ও ঘরে বাইরে (অংশ বিশেষ)।

ছোটগল্প: প্রতিহিংসা, ঠাকুরদা, কাদম্বরী (সূচনা)।

প্রবন্ধ: পঞ্চভূত (অংশ বিশেষ), রাজা-প্রজা (অংশ বিশেষ), ধর্মের নবযুগ, পিতার বোধ।

পতিসরে বসে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রায় ৪৩টি চিঠি লিখেছেন মর্মে তথ্য পাওয়া যায়। পরগনায় বসে সময় পেলেই তিনি তখন পত্রগুলো লিখতেন। এর মধ্যে ২৬টি পত্র তিনি লিখেছেন তাঁর ভাইঝি ইন্দিরা দেবীকে।[৪৪] জমিদারি দেখভাল করতে এসে প্রথমে কবি এখানে মন বসাতে পারে নি। তবে প্রকৃতি ও মানবদরদী এই মানুষটি এখানকার সব কিছুকে পরবর্তীতে আপন করে নেন। শুধু তাই নয়, নতুন জগত ও তার রূপের দার্শনিক পরিচয় প্রকৃতভাবে তিনি এখানেই পেয়ে যান। জনগণকে ও এখানকার সব কিছুকে বুঝে উঠার পর কবি সৃষ্টিশীল চিন্তায় মগ্ন হয়ে পড়েন। আপন মননের খোরাক কবি এখান থেকে সহজেই সঞ্চয় করতে পেরেছিলেন।

কবি পতিসরে শেষবার এসেছিলেন পুণ্যাহ অনুষ্ঠানে যোগদানের জন্য। তখন কবির সফরসঙ্গী ছিলেন নগেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী ও একান্ত সচিব সুকান্ত রায় চৌধুরী। কবি শিয়ালদহ থেকে রেলপথে সেবার আত্রাই এসেছিলেন। আত্রাই থেকে নদী পথে পতিসরে এসে পৌছান। সে দিন মুসলধারে বৃষ্টি হচ্ছিল। বৃষ্টি মাথায় নিয়েই কবি পতিসরে আসেন। এই পুণ্যাহ অনুষ্ঠানটি ছিল বুধবার দিন। সেদিন কবিকে দেখার জন্য বিস্তর প্রজার ভিড়। এদিনই কবিকে কাচারি বাড়িতে সংবর্ধনা জনানো হয়। পরগনার প্রজাদের পক্ষে রাতোয়াল গ্রামের জোতদার মো. কফিলুদ্দিন আকন্দ শ্রদ্ধাঞ্জলি পাঠ করেন। শ্রদ্ধাঞ্জলি পাঠ শেষে কবির কণ্ঠে বিষাদের সুর ধ্বনিত হয়। এর জবাবে কবি বলেন- 'সংসার থেকে বিদায় নেবার সময় তোমাদের সঙ্গে দেখা হলো এইটেই আমার সান্ত্বনা। তোমাদের কাছে অনেক পেয়েছি কিন্তু কিছু দিতে পেরেছি বলে মনে হয় না। সে সব কথা মনে হলে বড় দুঃখ পাই। কিন্তু আর সময় নেই, আমার যাবার সময় হয়েছে, শরীর আমার অসুস্থ, এ অবস্থায় তোমাদের উন্নতির জন্য কিছু করার ইচ্ছা থাকলেও আমার সময় ফুরিয়ে এসেছে। তোমরা নিজের পায়ে দাঁড়াও, তোমাদের সবার মঙ্গল হোক- তোমাদের সবাইকে এই আশীর্বাদই আমার শেষ আশীর্বাদ।'[৪৫] কবির কথা শুনে পরিবেশ তখন বিষণ্ন হয়ে উঠে। সবার চোখে পানি। একটু চুপ করে থাকার পর কবি আবার বলেন- 'তোমাদের জন্য কিছু করতে পারি নি। ইচ্ছা ছিল মান সম্মান সম্ভ্রম সব ছেড়ে দিয়ে তোমাদের সঙ্গে তোমাদের মতোই সহজ হয়ে জীবনটা

কাটিয়ে দেই। কী করে বাঁচতে হবে তোমাদের সঙ্গে মিলে সেই সাধনা করব, কিন্তু আমার এ বয়সে তা হবার নয়। আমার যাবার সময় এসেছে। এই নিয়ে দুঃখ করে কী করব। তোমাদের সবার উন্নতি হোক এই কামনা নিয়ে আমি পরলোকে চলে যাব।' কলকাতা থেকে পতিসরে জমিদারি তদারকি করার জন্য কবিকে পতিসরে এসে সাময়িক অবস্থান করতে হয়েছে। আর এই অবস্থানের কারণে ও সাময়িক বসবাসের ফলে এতদ্অঞ্চলের কিছু পরিবার ও জমিদারি এস্টেটের কতিপয় কর্মচারীর সাথে কবির সখ্যতা গড়ে উঠেছিল। সখ্যতার সম্পর্ক যাঁদের সাথে গড়ে ওঠেছিল তাঁরা হলেন—পতিসরের এস্টেটকর্মী শৈলেশচন্দ্র মজুমদার, গ্রাম সংগঠক কালীমোহন ঘোষ, এস্টেটের কর্মী হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, বিপ্লবী গ্রাম সংগঠক অতুল সেন এবং রাতোয়ালের আকন্দ পরিবার অন্যতম। তবে 'কালিগ্রাম পরগনার মানুষগুলো যে খুব সহজ-সরল ও সাদাসিধে প্রকৃতির ছিল সে বিষয় সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর উচ্ছ্বসিত ভাষায় প্রশংসা করেছেন।[৪৬] এভাবেই কালের আবর্তে ক্রমাগতভাবে বিলিন হতে থাকে জোড়াসাঁকোর ঠাকুর পরিবার ও পতিসর তথা কালিগ্রাম পরগনার জমিদারি এস্টেট। কিন্তু পতিসরে রবীন্দ্রনাথ অবস্থানকালীন প্রজাদের মঙ্গলসাধনে কবির কর্ম ও তাঁর সৃজনশীল এবং মননশীল সৃষ্টি ইতিহাসের পাতায় গভীর শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করবে এতদাঞ্চলের জনগোষ্ঠী।

তথ্যসূচি:

---

১ প্রফেসর মুহম্মদ আবুল ফজল ও অ্যনান্য-সম্পাদিত, *বরেন্দ্র অঞ্চলের ইতিহাস* (ঢাকা: গতিধারা-২০০৯), পৃ- ১১৭৩

২ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *ছিন্ন পত্রাবলী* (কলকাতা : বিশ্বভারতী, পুনর্মুদ্রণ, বৈশাখ ১৯৬৩), পৃ- ২৭

৩ *তদেব*, পৃ-২৮

৪ আহমদ রফিক, *রবীন্দ্রস্মৃতি:পতিসর অন্যমাত্রায় অনন্য* (বগুড়া:শকুন্তলা, সার্ধশত রবীন্দ্র জন্মোৎসব স্মারক গ্রন্থ, ২৫ বৈশাখ ১৪১৮বঙ্গাব্দ), পৃ-২০

৫ 'প্রতিহিংসা' গল্পের আঙ্গিকের সাথে 'দুই বিঘা জমি' কবিতার একটা ঘনিষ্ঠ মিল লক্ষ্য করা যায়। 'প্রতিহিংসা' গল্পের জমিদার দেওয়ান সেরেস্তার কর্মচারীদের কার্যকলাপের মধ্যে 'বাবু' ও 'উপেনের' সাক্ষ্য মেলে। 'ঠাকুর্দা' গল্পটিও কবি একই সময়ে লেখেন। এ বছর ভাদ্র মাসে পুত্র রথীন্দ্রনাথকে কবি সাথে নিয়ে স্টিমার যোগে রাজশাহীর রামপুর-বোয়ালিয়াতে আসেন লোকেন পালিতের সাথে সাক্ষাতের জন্য। প্রফেসর মুহম্মদ আবুল ফজল ও অ্যনান্য-সম্পাদিত, *বরেন্দ্র অঞ্চলের ইতিহাস*, প্রাগুক্ত, পৃ- ১১৭৮

৬ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *ছিন্ন পত্রাবলী*, প্রাগুক্ত, পৃ-১৬৬

৭ প্রফেসর মুহম্মদ আবুল ফজল ও অ্যনান্য-সম্পাদিত, *বরেন্দ্র অঞ্চলের ইতিহাস*, প্রাগুক্ত, পৃ- ১১৮০

৮ *তদেব*, পৃ- ১১৮০

৯ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *ছিন্ন পত্রাবলী*, প্রাগুক্ত, পৃ- ৩৪৮

১০ *চিঠিপত্র* (১ম খণ্ড), বিশ্বভারতী- ১৩৭২, পত্র- ৩২, পৃ-৬২-৬৩

১১ প্রশান্তকুমার পাল, *রবীন্দ্র জীবনী-৪র্থ খণ্ড* (কলকাতা-১৩৯৫), পৃ- ১৮৭

১২ *তদেব*, পৃ- ১১০

[১৩] *তদেব*, পৃ- ১১১
[১৪] দেশ, ১৩৯৩ (৬ অগ্রহায়ণ), পৃ- ১৭, পত্র-২৪
[১৫] রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *ছিন্ন পত্রাবলী*, প্রাগুক্ত, পৃ- ৩৩৬-৩৩৭
[১৬] মো. খোসবর আলী, *নওগাঁ জেলার ইতিহাস-২য় খণ্ড* (রাজশাহী : স্বাগতম অফসেট প্রেস-২০১৪), পৃ- ২৯২
[১৭] দেশ ১৩৬২ (২০ অগ্রহায়ণ), পৃ- ২৪১-৪২, পত্র-১২
[১৮] প্রফেসর মুহম্মদ আবুল ফজল ও অ্যনান্য-সম্পাদিত, *বরেন্দ্র অঞ্চলের ইতিহাস*, প্রাগুক্ত, পৃ- ১১৮৪
[১৯] *তদেব*, পৃ- ১১৯৪
[২০] *তদেব*, পৃ- ১১৯৫
[২১] *তদেব*, পৃ- ১১৯৫
[২২] *তদেব*, পৃ- ১১৯৬
[২৩] মাহমুদ মুসা,*কালীগ্রাম পরগনায় শিক্ষা বিস্তারে রবীন্দ্রনা* (বগুড়া : শকুন্তলা,১৪৮তম রবীন্দ্র জন্মোৎসব স্মারক পত্রিকা,১৪১৬ বঙ্গাব্দ), পৃ-৪১
[২৪] *তদেব*, পৃ-৪১
[২৫] *তদেব*, পৃ- ৪১
[২৬] *তদেব*, পৃ-৪২
[২৭] মাহমুদ মুসা, *কালীগ্রাম পরগনায় শিক্ষা বিস্তারে রবীন্দ্রনাথ*, প্রাগুক্ত,পৃ-৪২
[২৮] *তদেব*, পৃ-৪২
[২৯] খান সাহেব মোহাম্মদ আফজল, *নওগাঁ মহকুমার ইতিহাস* (চট্টগ্রাম : ইষ্টার্ণ কমার্শিয়াল প্রেস-১৯৭৪), পৃ- ৯১
[৩০] রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *ছিন্ন পত্রাবলী*, প্রাগুক্ত, পৃ-১৭০
[৩১] আহমদ রফিক, *রবীন্দ্রস্মৃতি : পতিসর অন্যমাত্রায় অনন্য*, প্রাগুক্ত, পৃ-২১
[৩২] প্রফেসর মুহম্মদ আবুল ফজল ও অ্যনান্য-সম্পাদিত, *বরেন্দ্র অঞ্চলের ইতিহাস*, প্রাগুক্ত, পৃ- ১১৮১
[৩৩] আহমদ রফিক, *রবীন্দ্রস্মৃতি : পতিসর অন্যমাত্রায় অনন্য*, প্রাগুক্ত, পৃ-২১
[৩৪] মো. আবদুস সালাম, *যেভাবে হয়ে ওঠেন জনগণের রবীন্দ্রনাথ*(জেলা প্রশাসন,নওগাঁ:রবীন্দ্র জন্মোৎসব স্মারক পত্রিকা,২৫বৈশাখ ১৪১৭),পৃ-৬২
[৩৫] ড. মোহাম্মদ শামসুল আলম,*পতিসরের জমিদার ও মানুষ রবীন্দ্রনাথ* (জেলা প্রশাসন,নওগাঁ:রবীন্দ্র জন্মোৎসব পত্রিকা,২৫ বৈশাখ ১৪১৬),পৃ-৪৭
[৩৬] রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *ছিন্ন পত্রাবলী*, প্রাগুক্ত, পৃ-২৮
[৩৭] আহমদ রফিক,*রবীন্দ্রস্মৃতি বিজড়িত পতিসরে আমাদের সমাপন,আমাদের করণীয়*(জেলা প্রশাসন,নওগাঁ:রবীন্দ্র জন্মোৎসব পত্রিকা-১৪১৩),পৃ-২০
[৩৮] *তদেব*, পৃ-২০
[৩৯] রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *ছিন্ন পত্রাবলী*, প্রাগুক্ত, পৃ- ১৭৪
[৪০] *তদেব*, পৃ-১৭৫
[৪১] *তদেব*, পৃ-১৭৫-১৭৬
[৪২] আব্দুল হাই শিকদার, *কবিতীর্থ পতিসর* (জেলা প্রশাসন, নওগাঁ : রবীন্দ্র জন্মোৎসব স্মারক পত্রিকা, ২৫ বৈশাখ ১৪১৩), পৃ-২৪
[৪৩] মো. খোসবর আলী, *নওগাঁ জেলার ইতিহাস-২য় খণ্ড*, প্রাগুক্ত, পৃ- ২৯৭
[৪৪] *তদেব*, পৃ-২৯৮
[৪৫] প্রফেসর মুহম্মদ আবুল ফজল ও অ্যনান্য-সম্পাদিত, *বরেন্দ্র অঞ্চলের ইতিহাস*, প্রাগুক্ত, পৃ- ১১৯৮
[৪৬] মোহাম্মদ শামসুল আলম, *পতিসরে রবীন্দ্রনাথ* (ফারুক আহমেদ-সম্পাদিত, *উদার আকাশ*-জার্নাল, ঈদ-শারদ সংখ্যা, ১৮ বর্ষ:সংখ্যা-২, ২৯ জুলাই-২০১৯, দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত), পৃ- ৪৪